প্রজাতান্ত্রিকযুগের ত্রিপুরা

দীনেশ চন্দ্র সাহা

প্রজাতান্ত্রিক যুগের ত্রিপুরা
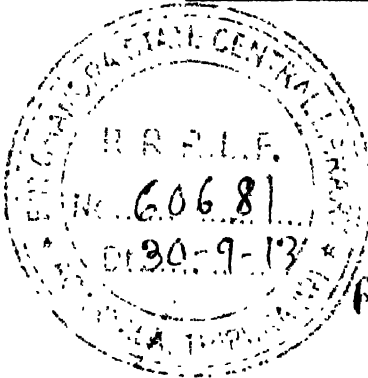
দীনেশ চন্দ্র সাহা

রাইটার্স পাবলিকেশন

প্যালেস কম্পাউন্ড ইষ্ট

আগরতলা, ত্রিপুরা

PRAJATANTRIK JUGER TRIPURA

By: Dinesh Ch. Saha

Writer's Publication,

Place Compount East, Near Town Hall

Agartala, Tripura (w)

(M)- 9862610480

Price: Rs. 150 (One Hundred Fifty) only

পরিমার্জিত সংস্করণ	ঃ	বইমেলা ২০১১
প্রকাশক	ঃ	দীনেশ চন্দ্র সাহা
প্রচ্ছদ	ঃ	কর্ণজিৎ দে, আগরতলা
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা।
মুদ্রণ	ঃ	অনিল লিথোগ্রাফিং কোং, কলকাতা -১২
মূল্য	ঃ	১৫০ (দেড়শত) টাকা।

ISBN- 978-81-904859-1-3

রাইটার্সপাবলিকেশন

প্যালেস কম্পাউন্ড ইষ্ট, টাউন হলের পাশে,

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, মোঃ নংঃ ৯৮৬২৬১০৪৮০,

জনসেবা পরিষদ, আগরতলা

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আধুনিক যুগের আলোকছটায় উদ্ভাসিত হয়েছে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। মহারাজাদের চিন্তা চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের প্রজাদের প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধ। শিল্পে, ভাস্কর্যে ফুটে উঠেছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল রূপ। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ,-কুঞ্জবন প্রাসাদ এবং নীরমহল পর পর তিনজন মহারাজার উন্নত রুচিবোধের নিদর্শণরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রজাতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে ত্রিপুরায়। ইউরোপের প্রতিটি দেশে বহু রক্তপাতের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে, জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে -- ঘটে গেছে একটি নীরব বিপ্লব। মহারাজা স্বেচ্ছায় -- যোগ দিয়েছেন স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রে।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং ইউরোপীয় সমাজ-সাহিত্য-দর্শণ-বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছে। জাতীয়তাবোধই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় ঐক্য, অখন্ডতা এবং জাতীয় সংহতি -- সুদৃঢ় হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দেশের সমস্ত ধর্ম- বর্ণ ও ভাষার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বৃটিশ ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যই জনকল্যাণকামী প্রজাতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়েছে।

ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল না। বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করেই কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেছে। কোন দেশীয় রাজ্যেই প্রজা কল্যাণমূলক কোন কর্মসূচী ছিল না। প্রজাদের প্রতি রাজার কর্তব্য সম্পর্কে প্রাচীন ভারতে যে আদর্শ প্রচার করা হয়েছিল তা কোন রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করার মত আর্থিক সামর্থ্য রাজাদের ছিল না। সে জন্যই গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রজাদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে দেশীয় রাজারা বাধ্য হয়েছিলেন।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর প্রায় ৬০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। শত শত বছরের বঞ্চিত প্রজারা এই সময়ের মধ্যে কি পেয়েছেন তার মূল্যায়ন করার সময় হয়েছে। কি পাননি তারও হিসেব নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থটিতে রাজন্য যুগের সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক যুগের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের পক্ষেই এই প্রেক্ষাপট

জানা থাকা দরকার। নাগরিক চেতনার বিকাশ এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রয়োজনেই রাজ্যের এবং দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উন্নয়নের ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

ইতিহাস রচনা ও বর্ণনা করা কঠিন কাজ। কখনোই সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। অসংখ্য উপাদানে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই সাজিয়ে দিলাম পাঠক-পাঠিকাদের সামনে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও এ গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন আশা করি। এই গ্রন্থ পাঠ করে ছাত্র-ছাত্রীরা দুদিক থেকে উপকৃত হবেন। প্রথমতঃ ত্রিপুরায় প্রজাতান্ত্রিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পাঠক-পাঠিকার মনে ইতিহাস চেতনাকে জাগিয়ে দেবে। দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থ পাঠ করে ত্রিপুরা সম্পর্কে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জ্ঞান অর্জন করবেন।

বিভিন্ন তথ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি সংগ্রহের কাজে আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রবীণ নেতাদের কাছ থেকে। এছাড়াও সাহায্য পেয়েছি বন্ধুবর ধবল কৃষ্ণ দেববর্মণ, রমাপ্রসাদ দত্ত, অমল দাশগুপ্ত ও রবীন সেনগুপ্তের কাছ থেকে। তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সময় এবং সুযোগের অভাবে বহু বিষয়ে তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে পাঠক-পাঠিকাদের সাহায্য সহযোগিতা ও সুপরামর্শ কামনা করি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডেইলি দেশের কথা, দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ, জাগরণ, নাগরিক, সমাচার, সেবক, ত্রিপুরার কথা, চিনিহা, ত্রিপুরা ও গণরাজ ইত্যাদি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

আগরতলা-
২৬শে জানুয়ারী, ২০০৯

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার

পূর্ণ রাজ্য দিবস উদ্‌যাপন—২০০৯

দিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতভূক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের অনুষ্ঠান চিত্র
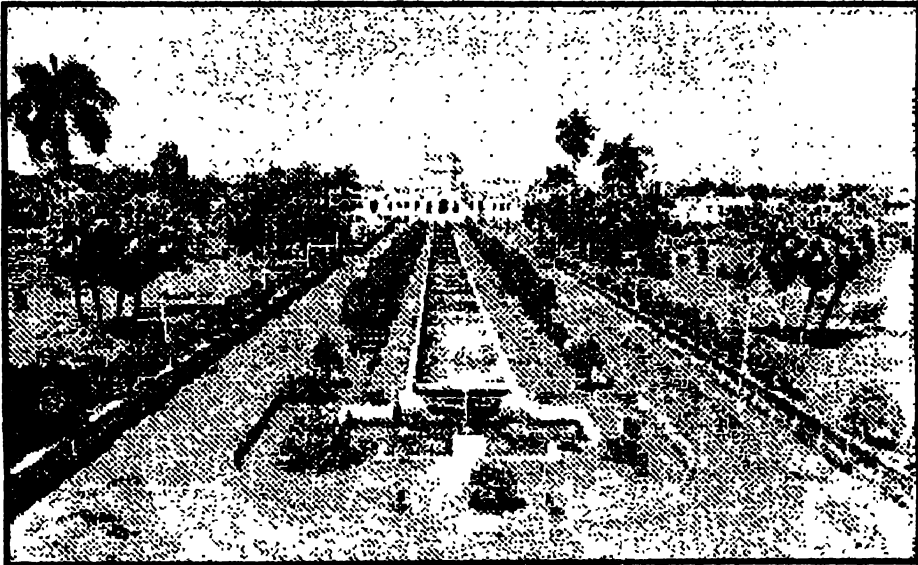
রাজন্য যুগের রাজপ্রাসাদ প্রজাতান্ত্রিক যুগের বিধানসভা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

- ত্রিপুরায় প্রজাতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত — ৯
- অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা — ১৮
- স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তরাধিকার — ২৩
- প্রজাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর প্রস্তুতি পর্ব — ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

- ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা — ৪৪
- ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও তার মূল্যায়ন — ৫২
- ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টিতে উদ্বাস্তুদের অবদান — ৬৩
- ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্বাসন সমস্যা — ৬৭
- ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও সম্ভাবনা — ৭৭

তৃতীয় অধ্যায়

- ত্রিপুরায় জাতীয় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব — ৮৭
- প্রথম সাধারণ নির্বাচন — ১৯৫২ — ৯০
- সাধারণ নির্বাচন ও জনমতের প্রতিফলন — ৯৪
- প্রশাসনিক সংস্কার - বিস্তার ও উন্নয়ন — ১০২
- পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরায় বাজেট ও উন্নয়ন সমস্যা — ১০৮

চতুর্থ অধ্যায়

- ত্রিপুরায় জনমুখী প্রশাসন — ১২০
- গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিবর্তন — ১২৫
- ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন — ১৩০
- নগরোন্নয়ন ও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা — ১৪০
- আগরতলা পুরসভার উন্নয়ন ও বিস্তার — ১৪৭.

পঞ্চম অধ্যায়

- ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক উদ্যোগ — ১৫৩
- শিক্ষা বিপ্লব — ১৫৫
- কৃষি বিপ্লব — ১৬৮
- যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব — ১৭৭
- স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিপ্লব — ১৮২

ষষ্ঠ অধ্যায়

- ত্রিপুরায় সমবায় আন্দোলন — ১৮৯
- শিল্প বাণিজ্যে নবযুগ — ১৯২
- বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস — ১৯৭
- বনজ সম্পদ ও সামাজিক বনায়ন — ২০১
- রাজ্যের জনশক্তি ও কর্মসংস্থান — ২০৭

সপ্তম অধ্যায়

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ — ২১৩
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য — ২১৭
- ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অসন্তোষের কারণ — ২২৮

অষ্টম অধ্যায়

- জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোতে অস্থিরতা ও বিভাজন — ২৩৭
- ত্রিপুরায় আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ও ভাঙ্গন — ২৪৪
- ত্রিপুরায় উপজাতি জাতীয়তাবাদ — ২৫২

নবম অধ্যায়

- ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন — ২৫৯
- ছাত্র আন্দোলন — ২৭০
- যুব আন্দোলন — ২৭২
- নারী আন্দোলন — ২৭৪
- দোকান কর্মচারীদের আন্দোলন — ২৭৫
- গৃহপরিচারিকাদের আন্দোলন — ২৭৬
- শ্রমিক আন্দোলন — ২৭৮
  (চা-শ্রমিক—মোটর শ্রমিক-বিড়ি শ্রমিক-
  জুটমিল শ্রমিক- রিক্সা, অটো রিক্সা শ্রমিক-রাবার শ্রমিক)
- শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলন — ২৮৮
- কৃষক আন্দোলন — ২৯২

দশম অধ্যায়

- ত্রিপুরায় সংবাদপত্র ও জনমত — ২৯৪
- সাহিত্য চর্চার নতুন ধারা — ২৯৮
- সাংস্কৃতিক চর্চায় বিবর্তণ — ৩০৫
- খেলাধুলায় আধুনিকতা — ৩০৯

একাদশ অধ্যায়

- ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতা — ৩১৪
- নতুন ভাবনা নতুন সম্ভাবনা — ৩১৬
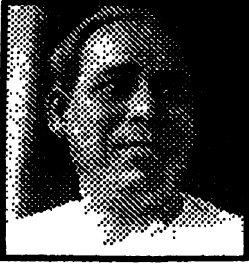
শচীন্দ্র লাল সিংহ

সুখময় সেনগুপ্ত

প্রফুল্ল কুমার দাস

রাধিকারঞ্জন গুপ্ত

নৃপেন চক্রবর্তী

সুধীররঞ্জন মজুমদার

সমীররঞ্জন বর্মণ

দশরথ দেব

মানিক সরকার

প্রজাতান্ত্রিক যুগের মুখ্যমন্ত্রীগণ

প্রথম অধ্যায়

ত্রিপুরায় প্রজাতান্ত্রিক যুগের সূত্রপাত

১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ তারিখে নাবালক রাজা কিরীট বিক্রমের প্রতিনিধি হিসেবে রিজেন্ট রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লীতে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান রণজিত কুমার রায়, মহারাণী রিজেন্ট রাজমাতা কাঞ্চন প্রভা দেবী, ভারতের দেশীয় রাজ্য মন্ত্রকের সচিব ভি পি মেনন এবং মহারাণীর পিতা পান্নার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিংহ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই চুক্তির ফলে ত্রিপুরায় বহুশত বছরের রাজন্য শাসনের অবসান হয় এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ইতিহাসের এই শান্তিপূর্ণ নীরব বিপ্লবের ফলে শত শত বছরের অবহেলিত নিপীড়িত ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত প্রজারা প্রকৃত স্বাধীনতার আলোতে উদ্ভাসিত হল এবং একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের গন্ডী থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করল ত্রিপুরার প্রজারা।

শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই এই ঘটনা ঘটল তা নয়। সারা ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলো একই সিদ্ধান্ত নিয়ে নবীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম দেশের সমস্ত রাজা-মাহারাজা-নবাব-বাদশা-জমিদার-তালুকদার ও সাধারণ প্রজা সকলেই সমান নগরিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হল, কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা দুই স্বাধীন রাষ্ট্রেরই প্রধান সমস্যা হয়ে রইল। আড়াই দশকের মধ্যেই ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ দুটি রাষ্ট্রকেই ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিনত করার জন্য মৌলবাদীদের প্রবল চাপে সামরিক বাহিনী প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে নানা কৌশলে বাধা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রজাতান্ত্রিক ভারত। কিন্তু এখানেও চলছে মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, এবং সন্ত্রাসবাদের অবিরাম চাপ। দেশ বিভাগ গোটা উপ মহাদেশেই একটি অভিশাপ রূপে গণ্য হচ্ছে। ধর্মান্ধতা বারবার অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলেছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা সকলেই কমবেশী দেশ বিভাগের জন্য দায়ী। সে সময়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে

নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারলেই ইতিহাসের কলংক চিহ্নগুলিকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে এবং প্রকৃত প্রজাতান্ত্রিক ইতিহাস গড়ে তোলা সহজ হবে।

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস গড়ে উঠেনি। প্রকৃতপক্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নেই। স্বাধীনতা লাভের আগে মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম এবং অরুণাচল, আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সমতল অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছিল। উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলোকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করার ব্যর্থতা অথবা অবহেলা স্বাধীন ভারতে বিরাট মানসিক পার্থক্য এবং জটিল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরা এবং মণিপুর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুটি মাত্র দেশীয় রাজ্য বৃটিশ শাসকদের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের বিনিময়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। আধুনিক শিক্ষা এবং নাগরিক চেতনার অভাবে প্রজাদের মধ্যে স্বাধীন উন্নত জীবনের মূল্যবোধ গড়ে উঠেনি।

১৯৪১ সালের জনগণনায় রাজ্যের একমাত্র নগর ছিল রাজধানী আগরতলা। এখানেও আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার সূত্রপাতও হয়েছে এই সময়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বীজ ছড়িয়েছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস হবার আগে রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপে উদ্যোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে দেশীয় রাজ্যগুলোতেও রাজার অধীনে সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ ছিল। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ ভারতে নির্বাচনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তার প্রভাবে ত্রিপুরা সহ অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও রাজার অধীনে প্রজার শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আগরতলা শহরের সচেতন যুবকদের উদ্যোগে **'ত্রিপুরা জনমঙ্গল সমিতির'** জন্ম হয়। এটাই ত্রিপুরার রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন প্রথম সংগঠন। প্রভাত রায়-বংশী ঠাকুর- বীরচন্দ্র দেববর্মা- বীরেন দত্ত - গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সমিতির নেতৃত্ব দেন। পাশাপাশি **'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ'** নামে আরেকটি সংগঠনের জন্ম হয় উমেশ লাল সিংহ, শচিন্দ্রলাল সিংহ ও সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে। এক বছরের মধ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যে সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হয়। স্বল্পকালীন আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে বন্দী করে আসামের বিভিন্ন জেলে পাঠানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না।

রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহকে যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন বলে প্রচার করেন তারা প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেন। রিয়াং বিদ্রোহের সঙ্গে

কোন রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ ছিল না। তখন আত্মগোপন করেও কোন রাজনৈতিক নেতা ত্রিপুরায় ছিলেন না। রিয়াং বিদ্রোহ ছিল রিয়াং সমাজের বহুকাল প্রচলিত রীতিকে বাতিল করে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার দেবী সিং রায় জীবিত থাকা অবস্থায় খগেন্দ্র রায়কে মহারাজার আদেশে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার নিয়োগ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নবনিযুক্ত সর্দারের জুলুম এবং তৎকালীন তীব্র অর্থনৈতিক সংকটই ছিল বিদ্রোহের মূল কারণ।

রিয়াং বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এমন এক সময় যখন জাপানের আক্রমণে বার্মা বিপর্যস্ত এবং বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পিছু হটছে। মণিপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনী ঢুকে পড়েছে। আরাকান পথে জাপানীরা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য ভীষণ এক দুশ্চিন্তায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে মহারাজার মনোনীত রিয়াং প্রধান খগেন্দ্র চৌধুরী অনবরত খবর পাঠাচ্ছিলেন যে রতনমনির নেতৃত্বে রিয়াংদের একটা বড় অংশ ডাকাতি শুরু করেছে। ডাকাত দল দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠাবার দাবীও তিনি করেছেন।

অন্যদিকে আতংকিত বৃটিশ বাহিনীর গুপ্তচররাও খবর দিচ্ছিল যে, রতনমণি খুব সম্ভবতঃ নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহযোগী গোষ্ঠী। যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতিতে ডাকাত দল সক্রিয় হবার পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে বলে আনুমানিক সন্দেহবশতঃ মহারাজাকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করা হল।

মহারাজা উদয়পুর থানাকে প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করে জানাবার নির্দেশ দিলেন। উদয়পুরেও তখন আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। যে কোন মুহূর্তে উদয়পুর ও অমরপুরে আক্রমণ হতে পারে বলে জোর গুজব ছড়িয়েছিল। উদয়পুর থানা থেকে একজন দারোগা এবং দুইজন কনস্টেবলকে পাঠানো হয় তদন্ত করে খবর দিতে। উদয়পুর থানায় অভিযোগ ছিল রতনমণির দল উদয়পুর, বিলোনীয়া ও অমরপুর বিভাগের রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মহারাজার মনোনীত সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরীর সমর্থক তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে।

দারোগাবাবু দুজন কনস্টেবল নিয়ে অমরপুরে তুইনানী ক্যাম্পে রতনমণির দলবলের অবস্থা ও অন্যান্য খবরাখবর নিতে পৌঁছার পর রতনমণির দলের লোকেরা তাদের ধরে নিয়ে রতনমণির সামনে হাজির করে। দারোগাবাবুর বর্ণনা অনুযায়ী রতনমণি একজন সাধু। তিনি দারোগাবাবুকে বলেন যে, রিয়াং সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব গরীব, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ. তাদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার করাই রতনমণির একমাত্র উদ্দেশ্য। রিয়াং সম্প্রদায়ের চির প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে মহারাজা নতুন সর্দার মনোনীত করেছেন। খগেন্দ্র চৌধুরী রাজার ক্ষমতা পেয়ে রিয়াংদের উপর বিশেষতঃ রতনমণির শিষ্যদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছেন। রতনমণির উদ্যোগে রিয়াং সর্দাররা মিলিত হয়ে একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু খগেন্দ্র চৌধুরী কোন প্রকার মীমাংসায় না আসায়

রাজ দরবারে অভিযোগ পেশ করা হয়।

সেকালের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রজাদের সঙ্গে রাজার কোন যোগাযোগ ছিল না। সর্দারের মারফতে মহারাজার মনোনীত মিসিপ রাজার সঙ্গে যোগাযোগ ও মীমাংসার দায়িত্ব নিতেন। তখনকার রিয়াং সম্প্রদায়ের মিসিপ হরচন্দ্রঠাকুর রিয়াং সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরীর সমর্থক ছিলেন। তাই মহারাজার কাছে মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করে রতনমণি ও তাঁর দলের শিষ্যদের ডাকাত বলে গুজব ছড়িয়েছেন।

কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত তদন্তকারী দারোগার সঙ্গে দেখা করে এরূপ খবর জানতে পেরেছেন। '**বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি**' নামক গ্রন্থে তিনি প্রাক্তন দারোগা ও বিদ্রোহী রিয়াং নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। রাজ দরবারে কোন সুবিচার পাওয়ার আশা নেই দেখে রিয়াং সর্দাররা নিজেরাই সমস্যার প্রতিকারের জন্য খগেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খগেন্দ্র চৌধুরীর সমর্থকদের বাড়ীঘর লুন্ঠন করে গরীব রিয়াংদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। খগেন্দ্র চৌধুরী রতনমণির শিষ্যদের সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি ও মোটা অংকের টাকা জরিমানা করতেন। রিয়াং সর্দাররা ২৫ জনের একটা কমিটি গঠন করে খগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে একটা মীমাংসার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু খগেন্দ্র চৌধুরী কোন প্রকার মীমাংসার পরিবর্তে কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা দল বেঁধে চৌধুরীর বাড়ীতে আক্রমণ করেছে। মহারাজার মনোনীত সর্দারকে অপমান করা রাজন্য যুগে মারাত্মক অপরাধ রূপে গণ্য হতো। অসহায় রিয়াং সর্দাররা লুসাই সর্দারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। এই খবর পেয়ে মহারাজা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। একদল সশস্ত্র সেনা পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রিয়াং বিদ্রোহীদের বেশীক্ষণ লড়াই করা সম্ভব ছিল না। বিদ্রোহীদের হাতে ছিল খড়গ, বল্লম, তীর, ধনুক এবং অল্প কয়েকটি গাদা বন্দুক। যুদ্ধের পরিস্থিতি থাকায় বারুদ সংগ্রহ করা যায়নি, বিদ্রোহীরা অনেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। গুরু রতনমণির উপদেশও তাই ছিল। মহারাজার সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনাই তাদের ছিল না। রতনমণি বিশ্বাস করতেন প্রজাদের দুঃখের কথা মহারাজার দরবারে উপস্থিত করতে পারলে সুবিচার পাওয়া যাবে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির জন্য সেই আশা পূর্ণ হল না।

৪৬৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৯৪টি দা, ৭টি কাঁচি এবং একটি তলোয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয়। তুইনানী ক্যাম্প থেকে অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। লক্ষ্মীছড়া এলাকায় ৪/৫ শত বিদ্রোহী কিছুক্ষণ লড়াই করে পালিয়ে যায়। সর্ব মোট ৬০০ বিদ্রোহী বন্দী হয়। তাদের হাতে কিছু বন্দুক ছিল কিন্তু বারুদ ছিল না। কয়েকজন নেতা পুলিশের গুলীতে নিহত হয়।

বিদ্রোহী নেতা, গুরু রতনমণি চট্টগ্রাম পাহাড়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু মাথায় জটা এবং

সাধুর পোষাক থাকায় আত্মগোপন করে বেশীদিন থাকতে পারেননি। বৃটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে রতনমণিকে আগরতলায় পাঠিয়ে দেয়।

রতনমণি পুলিশের দৃষ্টিতে ডাকাত দলের সর্দার এবং মহারাজার দৃষ্টিতে জাপানী অথবা আজাদ হিন্দ বাহিনীর গুপ্তচর বলে চিহ্নিত হন। রাজপ্রাসাদে নিষ্ঠুর দৈহিক নির্যাতনের ফলে ৬০ বছর বয়স্ক সাধু রতন মণি মৃত্যু বরণ করেন। রতনমণি শিষ্যদের কাছে শেষবারের মত উপদেশ দেন। 'যার যার জীবন রক্ষা কর, ঈশ্বর একদিন ন্যায় বিচার করবেন'। রতনমণির আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর চারদিকে উত্তেজনা দেখা দেয়। রাজদরবার থেকে প্রচার করা হয় রতনমণি হার্টফেল করে মারা গেছেন। প্রজাদের খুশী করার জন্য চারজন রাজ কর্মচারীকে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। রিয়াং সমাজে অসন্তোষের কারণ এবং আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির বিষয়ে মতামত সহ রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। কমিটি যথা সময়ে রিপোর্ট পেশ করেছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয়নি।

পরবর্তীকালে অনুসন্ধান কমিটির দুইজন সদস্য জিতেন ঠাকুর এবং কুমার নন্দলাল কর্তা বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎকারে যে সব তথ্য দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে, রিয়াং বিদ্রোহীদের মধ্যে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। মহারাজার মনোনীত সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরীর অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তারা প্রতিবাদী হয়েছিল। খগেন্দ্র চৌধুরী নিজের জমিতে রিয়াংদের বেগার খাটতে বাধ্য করতেন। সামান্য অপরাধে কঠোর দৈহিক নির্যাতন ও আর্থিক জরিমানা করতেন। রাজদরবারে প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রিয়াংরা বিদ্রোহ করেছিল।

কুমার নন্দলাল কর্তাও বলেছেন, রিয়াংরা খুবই দরিদ্র এবং ভক্ত ছিল। চির প্রচলিত সামাজিক প্রথায় আঘাত করার ফলেই তারা বিদ্রোহ করেছিল। ঘরচুক্তি কর বৃদ্ধিও বিদ্রোহের একটা কারণ।

বিদ্রোহী নেতা রতনমণির বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম পাহাড়ের রামগড় মহকুমার রামচীরা গ্রামে। পিতার নাম নীলকমল নোয়াতিয়া। মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া করেছেন। দীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করে সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। ত্রিপুরায় রিয়াংদের মধ্যে দশ বছর যাবত ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের কাজে লিপ্ত ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় আশ্রম তৈরী করেছিলেন। অমরপুরের চেলাগাং অঞ্চলের আশ্রমেই তিনি বেশীরভাগ সময় কাটাতেন। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে মহারাজার সমর্থন পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা পোষণ করতেন। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি না থাকলে তিনি সমাজ সংস্কারের কাজে মহারাজার সমর্থন লাভ করতে পারতেন। মাহারাজা বীর বিক্রমের মানসিকতা সমাজ সংস্কারের পক্ষেই ছিল।

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় ইতিপূর্বে যে কয়টি প্রজা বিদ্রোহ হয়েছে তার কোনটিই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে রাজ কর্মচারীদের অহেতুক নির্যাতনের

বিরুদ্ধেই প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছে। ১৮৫০ সালের ত্রিপুরী বা **তিপ্রা বিদ্রোহ,** ১৮৬০-৬১ সালের **কুকি বিদ্রোহ,** ১৮৬৩ সালের জমাতিয়া ও ১৯৪৩ সালের রিয়াং বিদ্রোহ এর কোনটিই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। এসব বিদ্রোহের পেছনে কোন প্রকার রাজনীতি ছিল না। তবে রাজ সিংহাসনের দাবীদার রাজ পরিবারের কোন কোন মহলের গোপন মদত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজ্যের কমিউনিষ্ট নেতাদের গোপন পরামর্শে শিক্ষিত উপজাতি যুবকেরা জনশিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য খুশী হয়েছিলেন। কারণ তিনিও উপজাতি সমাজে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষেই ছিলেন। ১৯৩১ সালেই তিনি রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আইন পাস করেছিলেন।

জনশিক্ষা সমিতি ছিল একটি অরাজনৈতিক সমাজ সংস্কারমূলক সংগঠন। এক বছরের মধ্যেই তিন শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সারা রাজ্যে এক ঐতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এই সংগঠনের যুব নেতারা। মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য সব কয়টি বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে যুব নেতাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছিল এই সময়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী ভারতীয় সেনা অফিসারদের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা দেশে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হল। আবার ভারতীয় নৌসেনারা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

একশ বছরের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়েছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। আবার ঠিক নব্বই বছর পর ভারতের নৌবাহিনীর বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল দেশীয় রাজাদের পূর্ণ সহযোগিতায়। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ভারতবর্ষে কোন দেশীয় রাজার পক্ষে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। প্রতিটি দেশীয় রাজ্যের প্রজারাই তখন গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এসব প্রজা অন্দোলনে জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া নৌবিদ্রোহীদের সমর্থন জানিয়েছিল ভারতীয় পদাতিক ও বিমান বাহিনী।

বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বিস্তার এবং রক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনী ছিল বৃটিশ বাহিনীর মূল শক্তি। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে ভারতীয় বাহিনী বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতীয় সেনা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৃটিশ সমর বিশেষজ্ঞরা গর্ব করেই বলতেন যে ভারতের জনগণের মধ্য থেকে এক বিশাল,শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত সামরিক ও আধা সামরিক এবং পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলাই বৃটিশ শাসকদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। এই শক্তিই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে চিরকাল রক্ষা করবে। বৃটিশ সেনাপতিরা আকাশ পথে উড়ে যাবার সময় নীচের পৃথিবীতে যা কিছু দেখতেন তার সবই একদিন ইংরেজের অধিকারে আসবে বলে বিশ্বাস করতেন। তাদের আত্মজীবনীতে এমন সব স্বপ্নের বিবরণ লিখে গেছেন।